CGIAR

INITIATIVE ON

Asian Mega-Deltas

বাগদা চিংড়ির নার্সারি ও চাষ ব্যবস্থাপনা

সিকিউরিং দি ফুড সিস্টেমস অফ এশিয়ান মেগা-ডেল্টাস ফর ক্লাইমেট এন্ড লাইভলিহুড রেজিলিয়েন্স (এএমডি)

WorldFish

CGIAR

সূচিপত্র

১. ঘের নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ **১**

২. বাগদা চিংড়ি চাষে ঘের প্রস্তুতি **২**

৩. পিএল/পোনার নার্সারি ব্যবস্থাপনা **৩**

৪. চিংড়ি চাষে মজুদপূর্ব সার ব্যবস্থাপনা **৪**

৫. চিংড়ি পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা **৫**

৫.১ মজুদপূর্ব করনীয় বা মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা ৫

৫.২ মজুদকালীন করনীয় বা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা ৫

৫.৩ মজুদ পরবর্তী করনীয় বা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ৬

৫.৪ অভ্যস্থকরণের গুরুত্ব ৭

৬. চিংড়ির প্রকৃতি, পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা **৭**

৭. চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার **৯**

৭.১ রোগের উৎস ৯

৭.২ চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার ৯

৭.৩ চিংড়ির কয়েকটি গুরুত্বপুর্ন রোগের কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ৯

৮. আহরণ ও আহরণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা **১২**

৯. বাজারজাতকরণ **১৩**

বাগদা চিংড়ির নার্সারি ও চাষ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। এ দেশে প্রচলিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতি নিম্নরূপ।

ক. সনাতন চাষ পদ্ধতি : এ ধরনের চাষ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত পুকুরগুলোর আকার সাধারনত অনিয়মিত, প্রতিটি পুকুর ১০০ থেকে ২০০ শতাংশ এবং ২ থেকে ৩ ফুট গভীর হয়ে থাকে। এটি চিংড়ি চাষের সব থেকে সহজ পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এ চাষ পদ্ধতিতে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত পোনা বেশি ব্যবহার করা হয়। সনাতন চাষ পদ্ধতিতে কোন সম্পূরক খাদ্য দেয়া হয় না। অপরিশোধিত ভাবে জোয়ারের পানি প্রবেশ করানো হয়।

খ. উন্নত সনাতন চাষ পদ্ধতি : উন্নত সনাতন চাষ পদ্ধতির পুকুর গুলো সাধারনত নিয়মিত আকারের হয়ে থাকে এবং প্রতিটি পুকুরের আয়তন ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ এবং পুকুরের গভীরতা ৩ ফুট থেকে ৪ ফুট হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে চিংড়িকে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি কিছু পরিমান সম্পূরক খাদ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। উন্নত সনাতন চাষ পদ্ধতিতে প্রতি বর্গমিটারে ৬-৮ টি করে পোনা/পিএল মজুদ করা হয়ে থাকে। জলাশয়ের পানির গুনাগুন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়।

গ. আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতি : আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে আধুনিক উপায়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুকুর প্রস্তুত করা হয় এবং পুকুরের আয়তন ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ হয়ে থাকে। এতে নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য প্রদানের পাশাপাশি অতিরিক্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের চাষ পদ্ধতিতে প্রতি বর্গ মিটারে ১৫-২৫ টি পোনা/পিএল মজুদ করা হয়।

ঘ. নিবিড় চাষ পদ্ধতি : বাংলাদেশে নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ এখনো শুরু হয়নি। এ ধরনের চাষ পদ্ধতিতে প্রতি বর্গমিটারে ৭০-১০০ টি পোনা/পিএল মজুদ করা হয় ও চিংড়ি কে সুষম খাদ্য প্রদান, জলাশয়ের মাটি ও পানির ভৌত-রাসায়নিক গুনাগুন পরিবীক্ষণ এবং সার্বক্ষণিক অতিরিক্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হয়।

উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ

১. ঘের নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- **পানির উৎস :** এমন স্থানে খামার স্থাপন করতে হবে যেখানে নদী/খাল থেকে সহজেই লবন পানি খামারে ঢুকানো ও বের করা যায়,পানি দূষণমুক্ত হয়।
- **দূষণমুক্ত এলাকা :** বাগদা চিংড়ি খামার নির্মাণের জন্য দূষণমুক্ত এলাকা প্রয়োজন।
- **নদী ভাঙ্গন প্রবন ও প্লাবন ঝুঁকিপূর্ন এলাকা :** নদী ভাঙ্গন প্রবন ও প্লাবন ঝুঁকিপূর্ন এলাকায় খামার ঝুঁকিপূর্ন থাকে। এ জন্য খামার স্থাপনের জন্য এ সকল এলাকা এড়িয়ে চলতে হবে।
- **মাটির গুণাগুণ :** মাটির গুনাগুন চিংড়ি চাষের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ন যা সহজেই খামারের পানিকে প্রভাবিত করে। খামার স্থাপনের জন্য মাটিতে নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন:
  ক) মাটিতে কাদার পরিমাণ পরিমিত থাকতে হবে।
  খ) মাটির পি-এইচ ৫ এর উপরে থাকতে হবে।
  গ) মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ যথাযথ থাকতে হবে (৫% বা তদুর্ধ্ব)।
  ঘ) মাটিতে এসিড সালফেট ও আয়রণের মাত্রা যথাক্রমে ০.০৩ পিপিএম ও ০.০১ পিপিএম এর কম থাকতে হবে।

চিত্র : বাগদা চিংড়ির ঘের

- **পানির গুণাগুণ :** চিংড়ি চাষের জন্য পানির গুণাগুণ নিম্নরূপ থাকা ভালো :

ক) লবনাক্ততা	৫ থেকে ২৫ পিপিটি
খ) তাপমাত্রা	২৪ থেকে ৩১ ডিগ্রি সে:
গ) পিএইচ	সকালঃ ৭.৫-৮.০ এবং বিকালঃ ৮.০-৮.৫
ঘ) এ্যালকালিনিটি	৮০ পিপিএম এর বেশী (বাইকার্বোনেট হিসেবে), ১২০-১৫০ পিপিএম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হিসেবে।
ঙ) দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫-৮ পিপিএম (সকাল কমপক্ষে ৪ পিপিএম, বিকাল সর্বোচ্চ ১২ পিপিএম)
চ) হাইড্রোজেন সালফাইড	০.০৩ পিপিএম এর কম।
ছ) আন-আয়োনাইজড এ্যামোনিয়া	০.১ পিপিএম এর কম।
জ) কীটনাশকের উপস্থিতি	থাকা উচিত নয়।

- **ভূ-প্রকৃতি :** খামারের ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের উপরিতল সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যেন খামারে পানি উঠানো নামানো সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন ও কার্যাদি সহজে করা যায়।
- **অবকাঠামোগত সুবিধা :** চিংড়ি খামার স্থাপনের জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সড়ক বর্তমান আছে।
- **পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন খাল :** চিংড়ি খামারে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের জন্য পৃথক খাল থাকা আবশ্যক।
- **নার্সারি পুকুর :** গ্রো-আউট/মজুদ পুকুরে চাষের পূর্বে চিংড়ি পোনা/পিএল অবশ্যই নার্সারি পুকুরে প্রতিপালন করতে হবে। নার্সারি পুকুরে প্রতিপালিত পোনা খামারে ছাড়া হলে মৃত্যু হার অনেক কমে যায়। সাধারণত খামারের মোট চাষ এলাকার ১০-২০% জায়গায় নার্সারি স্থাপন করতে হয়। প্রতিটি খামারে/ঘেরে নার্সারি পুকুর থাকা বাঞ্চনীয়।
- **পানি উত্তোলন/নিষ্কাশন গেইট :** পানি উত্তোলনের গেইট কাঠের, কংক্রিটের বা লোহার হতে পারে। খামারে একটি জোয়ারেও যেন ৩০% পানি ঢুকানো যায় এমনভাবে গেটের আয়তন ও সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।
- **জলাধার বা থিতানো পুকুর :** খামারে ঘোলা পানি থিতিয়ে নেয়া, পানি জীবাণুমুক্তকরণ এবং জোয়ার-ভাটার মধ্যবর্তী সময়ে পানি সঞ্চালনের জন্য খামারে এ ধরনের জলাধার রাখা গেলে চাষ ব্যবস্থাপনা এবং পানির গুনাগুন নিয়ন্ত্রিত রাখা যায়।

২. বাগদা চিংড়ি চাষে ঘের প্রস্তুতি

চুন প্রয়োগ : সম্পূর্ন পুকুর/ঘের শুকিয়ে ফেলতে হবে। শুকানোর (৫-৭) দিন পর পাথুরে চুন (ক্যালসিয়াম অক্সাইড) প্রতি শতাংশে ১-১.৫ কেজি হারে পানিতে গুলিয়ে সমস্ত পুকুর পাড়ের ও ঢালসহ ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন ক্রয় করার সময় পাথরের দলা অবস্থায় চুন কিনতে হবে। কোন অবস্থাতেই গুড়া চুন ক্রয় করা যাবে না।

চিত্র : ঘের প্রস্তুতি

চাষকালীন সময় ডলোমাইট বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ব্যবহার করতে হবে। যতদিন না পুকুরের তলদেশে কাদা শুকিয়ে শক্ত হচ্ছে ততদিন শুকিয়ে রাখতে হবে। সম্পূর্ন শুকিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন আগে সম্ভব হলে হাল চাষ করতে হবে। পুকুর/ঘেরের পাড়ে কোন গর্ত থাকা যাবে না। তাহলে মাছ ইঁদুরে খাবে এবং অন্য পুকুরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ও রোগবালাই এর ঝুঁকি বাড়বে। পুকুর প্রস্তুতি মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। পুকুর প্রস্তুতির পর নতুন পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

চিত্র : ঘেরে চুন প্রয়োগ

৩. পিএল/পোনার নার্সারি ব্যবস্থাপনা

নার্সারির উদ্দেশ্য

- রোগ/ভাইরাস প্রতিরোধ করা
- চিংড়ির পিএল কে ভাল পরিবেশে রাখা
- প্রয়োগকৃত খাদ্যের সুষম বন্টন করা
- চিংড়ি পিএল এর খাদ্য খেতে সুবিধা হয়
- নার্সারিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্য্য থাকে
- পিএল এর বাঁচার হার বৃদ্ধি পায়
- অবাঞ্চিত প্রাণির হাত থেকে রক্ষা পায়

নার্সারির তৈরির দিকনির্দেশনা

- পুকুরের ভেতর উপযুক্ত স্থানে নেটের হাপা অথবা নেট দিয়ে অস্থায়ী নার্সারি তৈরি করা যায়।
- নীল নেটের তলদেশ মাটির সাথে শক্তভাবে স্থাপন করা হয় যেন সহজে উঠে না যায়।
- সাধারণত পিএল/পোনার ঘনত্ব ৫০-১০০/বর্গ মিটারে রাখা হয়।
- এভাবে ১৫-২০ দিন রাখার পর নেট উঠিয়ে ফেলা হয়।
- নেটের হাপা ব্যবহার করলে বাশেঁর শক্ত খুঁটি দিয়ে ভালোভাবে আটকিয়ে দিতে হবে।

চিত্র : নার্সারি পুকুর

নার্সারির আকার

নার্সারির আকার নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর।

- পুকুরের পোনা মজুদের পরিমাণের ওপর
- নার্সারিতে কতদিন লালন পালন করা হবে

নার্সারির জন্য করনীয় বিষয়

- যথাযথ ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক পরিবেশ তৈরি করা
- প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন সমৃদ্ধ করা
  - ক) সার প্রয়োগের মাধ্যমে
  - খ) সাবস্ট্রেট ব্যবহার করে

ক) সার প্রয়োগ : চিংড়ি চাষের জন্য সার প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ন। প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সার হতে পেয়ে থাকে।

- সরিষার খৈল ১৫-২০ কেজি/হেক্টর
- চিটাগুড় (মোলাসেস) ১৫০ গ্রাম/শতক
- অটোপালিশ ১৫০ গ্রাম/শতক
- ঈষ্ট ৫ গ্রাম/শতক

মিশ্রনটি ৪৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে প্রয়োগ করতে হবে।

খ) সাবস্ট্রেট ব্যবহার : চিংড়ি চাষে আশ্রয়স্থল হিসেবে শুকনো নারিকেল পাতা, শুকনো কঞ্চি, শুকনা তাল পাতা, গোলপাতা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে চিংড়ি খোলস পরিবর্তনের সময় আশ্রয়স্থল হওয়া ছাড়াও এগুলোতে উপকারি ব্যাকটেরিয়া, শ্যাওলা, পেরিফাইটন জন্মায় যা চিংড়ি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৪. চিংড়ি চাষে মজুদপূর্ব সার ব্যবস্থাপনা

নার্সারিতে সার প্রয়োগ: নার্সারির পানি শোধনের ৩-৪ দিন পর সার প্রয়োগ করতে হবে। নার্সারিতে সার প্রয়োগের শতাংশ প্রতি পরিমাণ বা হার হলো নিম্নরুপ

উপাদান	পরিমাণ ডোজ (প্রতি শতাংশ)		প্রয়োগ পদ্ধতি
চিটাগুড়	১ম বার	২য় বার থেকে পরবর্তী	চিটাগুড়, অটোপালিশ ও ঈষ্ট আগের দিন একত্রে মিশিয়ে দ্বিগুন পরিমান পানিতে ভিজিয়ে (২৪-৪৮ ঘন্টা) রেখে পরদিন সকালে পানিতে ছিটিয়ে দিন।
	২০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	
অটোপালিশ	১০০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	
ঈষ্ট	১ চা চামচ	আধা চা চামচ	

৪-৫ দিন অন্তর অন্তর সার ব্যবহার করতে হবে। পানিতে প্রত্যাশিত রং (হালকা সবুজ, বাদামী সবুজ ইত্যাদি) না আসা পর্যন্ত সার প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে। এ সকল সার ব্যতীত নার্সারিতে অন্য কোন সার ব্যবহার না করাই ভালো। নিম্নে উল্লেখিত সার বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়।

উপাদান	প্রতি ৩৩ শতাংশে পরিমাণ	
ইউরিয়া	২	বিশেষ প্রয়োজনে ব্যাবহার করা হয়।
টি.এস.পি.	৩	

৫. চিংড়ি পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা

চিংড়ি চাষে বিভিন্ন ধাপগুলোর মধ্যে পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ মজুদ ব্যবস্থাপনার নিপুনতার উপর নির্ভর করছে মজুদোত্তর জীবিতের হার যা বার্ষিক উৎপাদনকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। পাশাপাশি এ কার্যক্রমটি যত্নসহকারে ও সঠিকভাবে সম্পাদনে ব্যর্থ হলে ঘেরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দেয়, যার ফলশ্রুতিতে ছোট চিংড়ি মরে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, সর্বোপরি বছর শেষে পুজি ফিরে না আসার ঘটনা ঘটে। চিংড়ি চাষের সার্বিক কার্যক্রম কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

৫.১ মজুদপূর্ব করনীয় বা মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা

এপর্যায়ে পোনা মজুদের তারিখ নির্ধারণের পর থেকে পোনা মজুদের আগের সময়টুকু যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে এ পর্বের করনীয়গুলো নিম্নরুপ :

- **পানির গভীরতা :** চিংড়ি চাষে নার্সারিতে পানির গভীরতা ০.৬-০.৭ মিটার এবং পালন ঘেরে ১.০-১.৫ মিটার হওয়া উচিত।
- **তাপমাত্রা :** বাগদা চিংড়ির উৎপাদন ২৫-৩১ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায় ভাল হয়।
- **পানির স্বচ্ছতা :** উন্নত সনাতন চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে ২৫-৩৫ সেঃ মিঃ গভীরতায় যদি সেকিডিস্ক অদৃশ্য হয়ে যায় তা চিংড়ি চাষে সহায়ক।
- **লবণাক্ততা :** ১০-২৫ পিপিটি লবণাক্ততায় বাগদা চিংড়ির উৎপাদন ভালো হয়।
- **পিএইচ :** চিংড়ি খামারে পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ হওয়া ভালো।
- **অম্লতা ও ক্ষারতা :** চিংড়ি চাষের উপযোগী অম্লতা ও ক্ষারতার মান হলো ৮০ ও ২০০ মিঃ গ্রাঃ/লিটার।
- **দ্রবীভূত অক্সিজেন :** চিংড়ি চাষের খামারে ৪-৮ পিপিএম বা ততোধিক দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকা ভাল, তবে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমপক্ষে ৩ পিপিএম থাকা উচিত।
- **অ্যামোনিয়া :** মুক্ত অ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.১ পিপিএম এর কম থাকা বাঞ্চনীয়।
- **হাইড্রোজেন সালফাইড :** চিংড়ি চাষে হাইড্রোজেন সালফাইডের কাঙ্ক্ষিত মাত্রা ০.০৩ পিপিএম এর কম।

৫.২ মজুদকালীন করনীয় বা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

- ঘেরে চিংড়ি পিএল/পোনা ছাড়ার আগে পোনাকে পুকুরের পানির লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ও পিএইচ এর মাত্রার সাথে অভ্যস্থ করে নিতে হবে। এ জন্য প্রায় ১ ঘন্টা সময় ধরে পোনার পরিবহনকৃত পানির সাথে মজুদ এলাকার পানিতে খাপ খাওয়ানোর কাজ করতে হবে।
- প্রথমে অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনকৃত পোনা ব্যাগ সহ পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে। এ অবস্থায় পরিবহনকৃত ব্যাগের পানি ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা একই মাত্রায় আনা যায়। তারপর ব্যাগের মুখ খুলে পুকুরের পানি অল্প অল্প করে ব্যাগে দিতে হবে এবং ব্যাগের পানি অল্প অল্প করে পুকুরে ফেলতে হবে। ৩০-৪০ মিনিট সময় ধরে এরুপভাবে পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। এতে পানির লবণাক্ততা, অক্সিজেন, পিএইচ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদির মাত্রা সমতায় চলে আসবে।

- হাড়িতে পরিবহনকৃত পোনা একই পদ্ধতিতে খাপ খাইয়ে পুকুরে ছাড়তে হবে। পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনা খাপ না খাইয়ে ছাড়া হলে হঠাৎ পরিবর্তিত পরিবেশে চিংড়ির পোনা সহজে দুর্বল হয়ে মারা যেতে পারে।

চিত্র : চিংড়ির পিএল পোনা পানিতে খাপ খাওয়ানো

- সকাল বা সন্ধ্যা পোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়। এ সময় তাপমাত্রা সহনীয় অবস্থায় থাকে।
- নার্সারিতে বাগদা চিংড়ি পিএল মজুদ ঘনত্ব (সংখ্যা/শতক)।
  ক) নতুন চাষির জন্য ১০০০-১২০০ টি
  খ) অভিজ্ঞ চাষির জন্য ১৩০০-২০০০ টি

পোনার গুনগত মান যাচাই : পোনার গুনগত মান যাচাই করে ক্রয় করা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পেনা অবশ্যই সুস্থ, সবল ও নীরোগ হতে হবে।

সুস্থ, সবল ও নীরোগ পোনার বাহ্যিক লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ :

- খোলসের স্বাভাবিক রং, উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, সুস্থ ও ভালো পরিবেশে লালিত পোনার লক্ষণ।
- উপাঙ্গসমূহের দৃঢ়তা ও স্বভাবিকতা রোগমুক্ত চিংড়ির লক্ষণ।
- চোখের দৃঢ়তা ও ভালো পোনার পরিচায়ক।
- খোলসের উপর পরজীবীর উপস্থিতি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পালিত বোঝা যায়।
- খাদ্য নালীর পূর্ণতা কম থাকলে পোনা অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পালিত বোঝা ঝায়।
- সুস্থ ও সবল পোনার সাঁতার কাটার সময় পোনা লম্বাভাবে সাঁতার কাটে ও পুচ্ছ ছড়ানো থাকে।
- পোনাকে বিরক্ত করলে লাফ দেয় বা পাত্রের গায়ের কাছ থেকে আচমকা সরে যায়।

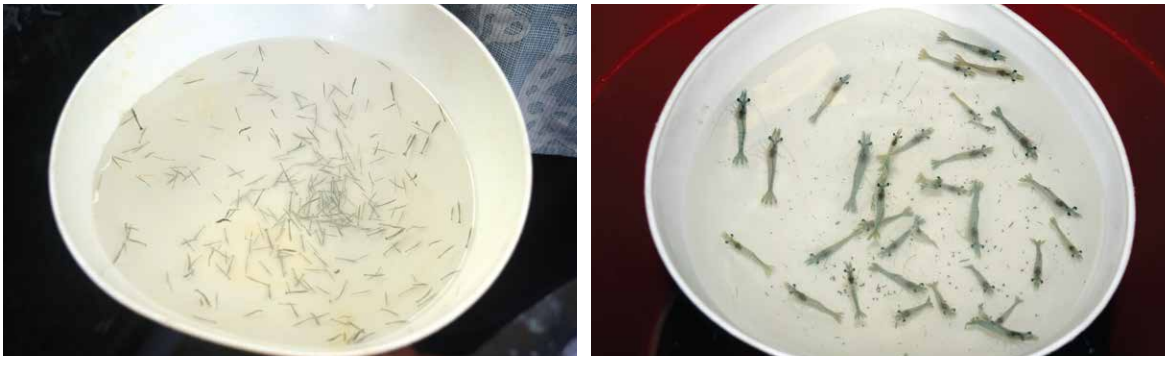

চিত্র : সুস্থ ও রোগমুক্ত চিংড়ি পিএল/জুভেনাইল

৫.৩ মজুদ পরবর্তী করনীয় বা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

নার্সারিতে পোনা মজুদের পর থেকে পরবর্তী ১০-২০ দিন এ পর্যায়ে অর্ন্তভূক্ত। পোনা ছাড়ার এক/দুই ঘন্টা পরে খাবার প্রয়োগ করতে হবে। খাবারের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি আলাদা অধিবেশন আছে। তদুপরি সংক্ষেপে খাবার প্রয়োগের সুবিধার্থে ছোট সহজ একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো-

১) প্রথম পাচঁ দিন প্রতি এক হাজার পোনার জন্য ১৫ গ্রাম হিসেবে খাবার প্রয়োগ করতে হবে।
২) পরবর্তী পাচঁ দিন প্রতি এক হাজার পোনার জন্য ২০ গ্রাম হিসেবে খাবার প্রয়োগ করতে হবে।
৩) পরবর্তী পাচঁ দিন প্রতি এক হাজার পোনার জন্য ২৫ গ্রাম হিসেবে খাবার প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা ছাড়ার প্রথম দু-চারদিন পোনা দেখা যাবে না। তারপর ভোরে পানির উপরে, পাড়ের কাছাকাছি স্থানে, লতানো ঘাস বা কোন আশ্রয়স্থলের/সাবস্ট্রেটের গায়ে ছোট ছোট পোনা ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে। সূর্য ওঠার পর আর দেখা যাবে না।

৫.৪ অভ্যস্থকরণের গুরুত্ব

তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, পিএইচ প্রভৃতির নিম্নমাত্রা ও আধিক্য চিংড়ির মধ্যে পীড়ন সৃষ্টি করে যা রোগ সংক্রমণের কারন/মৃত্যুর কারণ হতে পারে। হ্যাচারি বা নার্সারির নিয়ন্ত্রিত একটি পরিবেশ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোনা গুলো নতুন পরিবেশে ছাড়া হয় যা সহনীয় হওয়া অতীব জরুরী। নতুন পরিবেশে খুবই প্রতিকূলতার সম্মূখীন হতে হয় বিধায় পোনাকে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। যাতে চিংড়ি পোনা/পিএল পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করে চাপমুক্ত ভাবে অভ্যস্থ হতে পারে। যথেষ্ঠ সতর্কতা ও সার্থকতার সাথে এই কাজটি সম্পাদনে সামর্থ হলে-

- মজুদের সময় পোনা শারীরিকভাবে চাপের সম্মূখীন হবে না, ফলে বেশীরভাগ পোনা সুস্থ থাকবে ;
- মজুদকালীন মৃত্যুর হার কম হবে ;
- জীবিতের হার বৃদ্ধি পাবে যা বছর শেষে উৎপাদনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে ;
- চাষিকে ঘন ঘন এবং বেশী বেশী করে পোনা মজুদ করতে হবে না, ফলশ্রুতিতে মজুদ খাতে বেশ কিছু টাকা খরচ করা থেকে চাষি রেহাই পাবে ;
- পোনা মজুদের হার ১২০-২৪০ টি পর্যন্ত পোনা ছাড়া যেতে পারে;
- অতিরিক্ত পোনা ছাড়লে অতিরিক্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. চিংড়ির প্রকৃতি, পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : চিংড়ি ফাইটোপ্লাংকটন, শ্যাওলা, জুপ্লাংকটন, পোকামাকড়, ছোট চিংড়ি, ছোট শামুক-ঝিনুক এবং ছোট মাছ, লতাপাতার কচি অংশ, পচঁনশীল দ্রব্য ইত্যাদি খাবার খেতে পছন্দ করে।

ফাইটোপ্লাংকটন : ব্লু-গ্রীন শ্যাওলা (স্পিরুলিনা, অছিলেটরিয়া, এ্যনাবিনা, নসটক), গ্রীন শ্যাওলা (ক্লোরেলা, ক্লাডোসেরা, ডেসমিডস, ওডাগোনিয়াম এবং ডায়টমস, নেভিকুলা, সাইক্লোটেলা, সিটোসেরাস) ইত্যাদি।

জুপ্লাংকটন : প্রোটোজোয়া, রটিফার, ক্লাডোসিরা, কপিপোডা ইত্যাদি চিংড়ির প্রিয় খাদ্য। এ ছাড়া চিংড়ি নাজাস, পেরিফাইটন, পঁচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খায়। সব ধরনের খাবার খায় বলেই চিংড়িকে সর্বভূক প্রাণি বলা হয়। চিংড়ি স্বজাতিভোজী। বয়স, ঋতু ও স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে এদের খাদ্য ও খাদ্যাভাস পরিবর্তিত হয়।

পুষ্টি ও প্রকৃতি : সাধারণভাবে প্রায় ৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টি (nutrients) চিংড়ির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো-প্রোটিন (অতি প্রয়োজনীয় এ্যামিনো এসিড সমৃদ্ধ), লিপিড (উদ্ভিদ ও প্রাণি দেহ থেকে প্রাপ্ত অতি প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ তেল ও কোলেস্টেরল), শক্তি (শর্করা/কার্বোহাইড্রেড), ভিটামিনস, খনিজ পদার্থ (মিনারেলস)। চিংড়ির দ্রুততম এবং লাভজনক বৃদ্ধির জন্য চিংড়ির খাবারে বিভিন্ন পুষ্টির পরিমান নিম্নলিখিতভাবে থাকা উচিত। আমিষ-৪০-৬০%, স্নেহ/চর্বি-৫-১০%, শর্করা-চিংড়ির প্রজাতি হিসাবে।

পরিপূরক বা সম্পূরক খাদ্য : সম্পূরক খাবার কে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

- সজীব খাবার
- খামারে তৈরি মিশ্র খাবার
- কারখানায় তৈরি পিলেট বা বাণিজ্যিক খাবার

খামার বা ঘেরের জন্য খাদ্য তৈরির পদ্ধতি :

উপাদান	শতাংশ	১ কেজির জন্য প্রয়োজনীয় (গ্রাম)
মিহি চাউলের গুড়া	২০%	২০০
ফিস মিল	৪০%	৪০০
কাঁকড়া/চিংড়ি চূর্ণ	৪%	৪০
সিদ্ধ গম/ভাত	১৫%	১৫০

আটা/ময়দা	৫%	৫০
খৈল(সরিষা/নারকেল/সয়াবিন)	১০%	১০০
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.৫%	৫
আয়োডিন যুক্ত লবন	০.৫%	৫
চিটাগুড়	৫%	৫০
মোট=	১০০%	১০০০ গ্রাম

স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য নারিকেলের খৈল, সরিষা বা তিলের খৈল ব্যবহার করা যায় কিন্তু ব্যবহারের পূর্বে ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণ করে নিতে হবে।

কারখানায় তৈরি পিলেট বা বাণিজ্যিক খাবার : দেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি মাছের পিলেট খাবার তৈরির কারখানা রয়েছে। তারা বিভিন্ন মাছের জন্য বিভিন্ন খাদ্য তৈরি করে থাকে। তবে বাংলাদেশের চিংড়ির খাদ্যের চাহিদা মূলত আমদানির মাধ্যমে মেটানো হয়।

খাবার প্রয়োগ পদ্ধতি : চিংড়ির দেহের ওজনের ৫% খাদ্য প্রথম ৪-৫ সপ্তাহ (চিংড়ির ওজন ৫ গ্রাম) প্রদান করে পরবর্তীতে ৩-৪% প্রয়োগ করতে হবে। তবে খামারের বিভিন্ন স্থানে ফিডিং ট্রে স্থাপন করে চিংড়ির খাদ্য গ্রহন প্রবণতা যাচাই করে খাদ্যের পরিমাণ কমবেশী নির্ধারণ করতে হবে।

চিত্র : চিংড়ি ঘেরে খাবার প্রদান ও পর্যবেক্ষণ

খাদ্য প্রয়োগের সতর্কতা :

- ভাল মানের খাবার দিতে হবে।
- সঠিক পরিমাণে খাবার দিতে হবে।
- সঠিক সময়ে খাবার দিতে হবে।
- একই স্থানে, একই সময়ে খাবার দিতে হবে।
- মাঝে মাঝে খামারের মাছ চিংড়ি নমুনায়ন করে পরিমাণ ঠিক করতে হবে।
- নমুনায় প্রাপ্ত ওজন অনুযায়ী দিনে কতটা খাবার লাগবে তা ঠিক করতে হবে।
- দিনের সব খাবার একবারে নয়, বরং বারে বারে দিতে হবে।

খাদ্য সংরক্ষণ : ভাল উৎপাদন পাওয়ার জন্য খাদ্যের গুনগত মান সংরক্ষণ করা খুবই জরুরী। খাদ্য সংরক্ষণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন-

- শুষ্ক, ঠান্ডা এবং বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় খাদ্য সংরক্ষন করতে হবে।
- সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে এমন জায়গায় খাদ্য রাখা উচিৎ নয়।
- সরাসরি মাটিতে অথবা পাকা মেঝেতে খাবার রাখা উচিৎ নয়।
- কাঠের ফ্রেমের বা বিজ্ঞানসম্মত দানেশের উপর খাবার রাখলে ভালো হয়।
- ইঁদুর এবং পোকামাকড় থেকে সাবধানে রাখতে হবে।

৭. চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার

রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম (Prevention is better than cure) এই প্রবাদ বাক্যটি বাগদা চিংড়ির জন্য খুবই প্রযোজ্য। শরীর এবং মনের অস্বাভাবিক অবস্থাই রোগ। বর্তমানে চিংড়ি চাষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা হলো রোগ। অন্যান্য প্রাণির মতো চিংড়ির ও বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়। যখন চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় তখন চিংড়ি সহজেই জীবাণু দ্বারা বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। যে সমস্ত জীবাণু দ্বারা চিংড়ি রোগাক্রান্ত হয় তার মধ্যে পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস উল্লেখযোগ্য।

৭.১ রোগের উৎস : রোগজীবাণু ও পরজীবীর উৎসসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে।

- অত্যাধিক জৈব পদার্থের পঁচন
- মাছ ও চিংড়ির সাথে অনুপ্রবেশ
- বাহক প্রাণির (Host) সাথে অনুপ্রবেশ
- খাবারের সাথে অনুপ্রবেশ
- পানির সাথে অনুপ্রবেশ
- আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন
- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাক এর সংক্রমণ
- পরজীবী আক্রমণ

৭.২ চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার : চিংড়ি অত্যন্ত স্পর্শকাতর জলজ জীব। যে পরিবেশে চিংড়ি অবস্থান করে তার সামান্যতম তারতম্যের কারণে ও চিংড়ি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। যে কোন এক বা একাধিক অবস্থার দ্রুত তারতম্য ঘটলে চিংড়ি মারাও যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে অনেক সময় তাৎক্ষণিক প্রতিকার সহজসাধ্য নয় অথবা আর্থিক দিক বিবেচনায় প্রতিকার যৌক্তিক ও নয়। চিংড়ি চাষিদের জন্য যা সহজ তা হলো রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহন করা।

প্রতিরোধের উপায়সমূহ : রোগ প্রতিরোধের জন্য খামারে ভাল ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই।

মজুদপূর্ব পদক্ষেপ :

- সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত পোনা সংগ্রহ করা
- রোগাক্রান্ত ও দুর্বল পোনা মজুদ না করা
- পোনা যথাযথ টেকসই করে ছাড়া (নার্সারি প্রতিপালনের মাধ্যমে মজুদ করা)
- অবাঞ্চিত প্রাণির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা
- প্রাকৃতিক খাবারের মজুদ নিশ্চিত করা
- পানি থিতিয়ে বা শোধন করে খামারে উত্তোলন করা

মজুদ পরবর্তী প্রতিরোধ ব্যবস্থা :

- প্রতিবার ছেঁকে পানি তুলে ঘেরে/খামারে ক্ষতিকর প্রাণির অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ
- অতিরিক্ত পঁচনশীল দ্রব্যাদি থাকলে তা তুলে ফেলা
- পানির গভীরতা ৮০-১০০ সে:মি: রাখা
- প্লাংকটন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে রাখা
- সঠিক মাত্রায় খাবার প্রয়োগ করা
- সঠিক মানের খাবার প্রয়োগ করা

৭.৩ চিংড়ির কয়েকটি গুরুত্বপুর্ন রোগের কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. হোয়াইট স্পট রোগ : হোয়াইট স্পট নামক এই ধ্বংসাত্মাক ভাইরাসজনিত রোগের কারনে বাংলাদেশের লোনা পানির চিংড়ি শিল্প বিগত ২৮ বছর যাবৎ আক্রান্ত হয়ে আসছে। ১৯৯৪ বা ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম হোয়াইট স্পট রোগের সংক্রমণ ঘটে। যার ফলে

এই শিল্পের সাথে জড়িত সবাই (চাষি, ছোট ব্যবসায়ী, ডিপো মালিক, প্রসেসর) ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মোট রপ্তানি আয় কমে যায় এবং এই শিল্পের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে চিংড়ি শিল্পের সাথে জড়িত সকল সুফলভোগীরা ক্ষতি স্বীকার করে বা স্বল্প লাভে এই শিল্প পরিচালিত করছে। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের গতি অত্যন্ত মন্থর। যখন কোন ঘেরের চিংড়ি হোয়াইট স্পট রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন তা মহামারি রূপ ধারণ করে এবং ১০০ ভাগ চিংড়ি মারা যায়। কারণ হোয়াইট স্পট রোগ ভাইরাসের কারণে হয় এবং যার কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি।

হোয়াইট স্পট ভাইরাস রোগের লক্ষণসমুহ :

- খাদ্যে মন্দাভাব বা খাদ্যে অরুচি। চিংড়ির খাদ্য নালীতে খাবার শুন্য
- চিংড়ি দেখতে দুর্বল এবং দ্রুত নড়াচড়া না করা
- চিংড়ি পানির উপরে উঠে আসে এবং সাঁতার কাটতে থাকে
- দিনের বেলা চিংড়ি ঘেরের পাড়ে এসে জমা হয়
- ক্যারাপেস এর দুই পাশে ০.৫ মিমি-২ মিমি আয়তনের সাদা স্পট দেখা যায় এবং লেজেও এই ধরনের স্পট দেখা যায়। রোগ আক্রমণ মারাত্মক হলে সমস্ত দেহে স্পট দেখা যায়

চিত্র : হোয়াইট স্পট রোগ

হোয়াইট স্পট রোগের কোন চিকিৎসা নেই। চাষির এই রোগ এর আক্রমণের ফলে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিয়মিত খামার পরিদর্শন করতে হবে এবং রোগের প্রাদূর্ভাব হওয়ার সাথে সাথে চিংড়ি আহরণ শুরু করতে হবে। কখনও কখনও আক্রান্ত চিংড়ি সরিয়ে ফেললে বাকী চিংড়ি আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায় এবং মোট উৎপাদন ভালো হয়।

খ. মস্তক হলুদ রোগ : ইয়োলো হেড নামক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়। যকৃত অগ্নাশয়, গ্রন্থি ফ্যাকাশে হওয়ার ফলে মস্তক হলুদ বর্ণ ধারণ করে। পোনা মজুদের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে এই রোগ ধরা পড়ে। এ রোগেও ব্যাপক আকারে চিংড়ি মারা যায়।

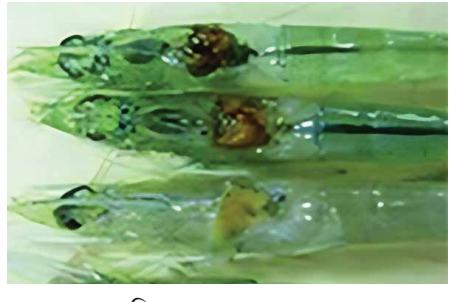

চিত্র : মস্তক হলুদ রোগ

প্রতিরোধ : সুষ্ঠ খামার ব্যবস্থাপনার ফলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। খামারের তলদেশে ভালো ভাবে রোদে শুকিয়ে চাষ করে ব্লিচিং পাউডার/চুন দিয়ে ভালো করে মাটি শোধন করে নিতে হবে।

গ. চিংড়ির কালো ফুলকা রোগ : পুকুরের তলায় মাত্রাতিরিক্ত হাইড্রোজেন সালফাইট এবং অন্যান্য জৈব্য পদার্থের কারণে এ রোগ দেখা যায়। খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা যায়। আক্রান্ত চিংড়ি ধীরে ধীরে মারা যায়। বড় চিংড়িতে এ রোগ বেশী হয় ।

চিত্র : কালো ফুলকা রোগ

প্রতিরোধ : পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে তলদেশের কাদামাটি তুলে ভালভাবে শুকিয়ে এবং পরিমাণ মত চুন/ডলোমাইট/ব্লিচিং পাউডার দিতে হবে। পুকুরের পাড়ের পাতা ঝরা গাছ কেটে ফেলতে হবে।

কালো দাগ রোগ : এটা চিংড়ির এক মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। পুকুরে অত্যাধিক জৈব পদার্থ থাকার কারণে এ রোগ হয়। চিংড়ির খোলস লেজ ও ফুলকায় কালো দাগ হয়। খোলসের গায়ে ছিদ্র হয়। পরবর্তীতে ফাংগাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চিংড়ি মারা যায়।

প্রতিরোধ : পুকুরের তলায় পচাঁ কাদা মাটি তুলে ভালমত শুকিয়ে চুন/সার দিয়ে পুকুর প্রস্তুত করতে হবে। চাষকালীন সময়ে নিয়মিত পানি পরিবর্তনসহ সুষম খাদ্য ও সার প্রয়োগ করতে হবে।

ঙ. সাদা মাংস রোগ : চিংড়ির লেজের দিক থেকে মাংস সাদা ও শক্ত হয়ে যাওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ। অধিক ঘনত্ব, প্রচুর জৈব পদার্থ ও তাপমাত্রার আধিক্যের কারণে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়।

প্রতিরোধ : পানির গভীরতা ও পোনা মজুদের হার সঠিক মাত্রায় রাখতে হবে।

চ. খোলস নরম রোগ : এটা একটা সাধারণ রোগ। ক্যালসিয়াম জনিত পুষ্টির অভাবে এ রোগ হয়। অনেকে একে স্পঞ্জ রোগ বলে থাকে। পানির লবণাক্ততা কমে গেলেও এই রোগে বাগদা চিংড়ি আক্রান্ত হতে পারে। খোলস বদলানোর ২৪ ঘন্টা পরও শক্ত হয় না । চিংড়ি কম বাড়ে ও ক্রমশ দুর্বল হয়ে মারা যায়।

প্রতিরোধ : ভালভাবে পুকুর শুকিয়ে চুন দিয়ে চাষের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। রোগের আক্রমণ হলে বড় চিংড়ি ধরে ফেলতে হবে। খামারে পানি নিষ্কাশনের ও প্রবেশের পৃথক ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ছ. চিংড়ির গায়ে শেওলা সমস্যা : বদ্ধ পানিতে অতিমাত্রায় খাদ্য প্রয়োগে সবুজ শেওলার আধিক্যের কারণে এ সমস্যা হয়ে থাকে। সাধারণত ছোট ছোট খামারে বিশেষ করে গলদা খামারে গায়ে শেওলা রোগ বেশী দেখা যায়। খোলস বদলাতে পারে না, বৃদ্ধি কম হয়, চিংড়ি আস্তে আস্তে মারা যায়।

প্রতিরোধ : পানির গভীরতা বাড়াতে হবে। মজুদ হার কমাতে হবে। চুন/সার ও খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা সীমিত রাখতে হবে।

জ. ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ : চিংড়ি বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এর মধ্যে ভিবরিও, সিডোমনাস, কাইটিনোভারাস এবং ফিলামেন্টাস ব্যাকটেরিয়া অন্যতম। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে চিংড়ির খোলসে কাল কাল স্পট সৃষ্টি হয়। খোলস ভেঙ্গে যায়, রং পরিবর্তন, রক্ত প্রবাহ কমে যায়, লেজের অংশ ও অন্যান্য উপাঙ্গ খসে পড়ে। এতে চিংড়ির ব্যাপক মৃত্যু হয় ও উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যায়।

প্রতিরোধ : ভালভাবে শুকিয়ে চুন/সার প্রয়োগ করে পুকুর প্রস্তুত করতে হবে এবং পানির সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।

ঝ. ছত্রাক রোগ : দীর্ঘদিন পানি পরিবর্তন না করলে স্যাপ্রোলিগনিয়া ছত্রাক দ্বারা চিংড়ি বেশী রোগাক্রান্ত হয়। এর আক্রমনের ফলে চিংড়ির ফুলকায় ফোটা ফোটা দাগ দেখা যায়। এতে খোলস নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাচারিতে লার্ভি, পি-এল বেশি আক্রান্ত হয়।

প্রতিরোধ : পুকুর বা ঘেরের তলা ভালোভাবে শুকিয়ে চুন প্রয়োগ করে চাষের জন্য তৈরি করতে হবে।

ঞ. অপুষ্টি জনিত রোগ : চিংড়ির খাদ্যে প্রয়োজনীয় এ্যামাইনো এসিড, কোলেষ্টেরল, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন-সি এর অভাবে অপুষ্টি জনিত রোগ হয়ে থাকে ।

প্রতিরোধ : সম্পুরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। নিয়মিত চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

ট. প্রোটোজোয়া জনিত রোগ : প্রোটোজোয়া কমেনসেলস, এপিটাইলিস, সিলিয়েট এবং যুথানিয়াম এর কারনে নানাবিধ রোগ হয় এক বা একাধিক প্রোটোজোয়ার আক্রমণে চিংড়ির খোলস পুষ্টিতন্ত্র এবং ফুলকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অস্বাস্থ্যকর ঘেরে এ রোগ দেখা দেয়।

প্রতিরোধ : পুকুর বা ঘেরের তলদেশের বর্জ্য পদার্থ ও কালো মাটি তুলে ফেলতে হবে এবং যুথানিয়াম আক্রমণ প্রতিরোধে পুকুর প্রস্তুতের সময় ব্লিচিং পাউডার এবং ফরমালিন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৮. আহরণ ও আহরণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা :

- চিংড়ি আহরণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হবে ।
- প্রয়োজনীয় লোকবল সংগ্রহ করে রাখা ।
- বাজার মূল্য সম্পর্কে খোজ খবর নেওয়া।
- প্লাস্টিক ঝুঁড়ি, ঝাঁকি জাল সংগ্রহ/মেরামত করা ।
- দরকারী আহরণোত্তর সংরক্ষণ সামগ্রী যেমন-বরফ, বাটখারাসহ ওজন করার পাল্লা ও প্লাস্টিকের ঝুঁড়ি ইত্যাদি চিংড়ি আহরণের পূর্বেই সংগ্রহ করা।
- ভোরে অথবা ঠান্ডা আবহাওয়ায় চিংড়ি আহরণ করা ।
- একদিন আগে খাবার দেওয়া বন্ধ করতে হবে।
- যদি তৈরি খাবারে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয় সে ক্ষেত্রে খাদ্যপ্রস্তুতকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর চিংড়ি আহরণ করতে হবে।
- আহরণের সময় সরঞ্জাম ও পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিংড়ির যাতে কম পীড়ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গই ব্যবস্থার পরিবর্তে উপযুক্ত ফাঁদ ও নির্ধারিত ফাসের ঝাঁকি জাল দিয়ে চিংড়ি ধরলে কম পীড়ন হয়।
- চিংড়ি অধিক আঘাত পায়, অঙ্গ বিনষ্ট হয় এবং ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এমন কোন পদ্ধতি, কৌশল কিংবা সরঞ্জাম দিয়ে চিংড়ি আহরণ থেকে বিরত থাকা ।
- চিংড়ি আহরণের পর বরফ ঠান্ডা পানিতে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে যাতে কোন কাদা বা ময়লা না থাকে ।

চিত্র : চিংড়ি আহরণ ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

৯. বাজারজাতকরণ :

চিংড়ি বাজারজাতকরণ ও বিপননের জন্য নীচে একটি চিত্র দেয়া হল-

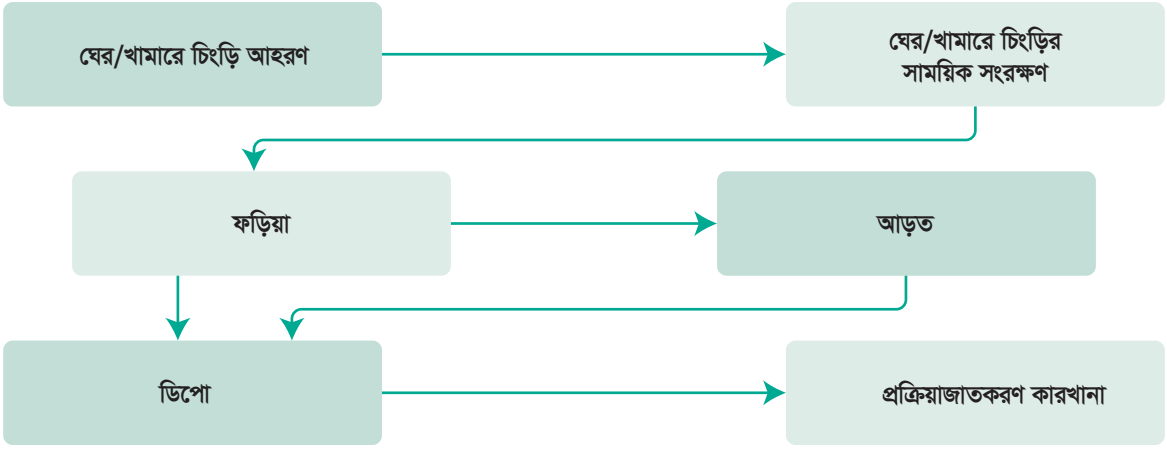

WorldFish CGIAR

বিস্তারিত যোগাযোগ

ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

বাড়ি ৩৩৫/এ, সড়ক ১১৪, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২

ফোন : +৮৮০ ২ ৪১০৮ ০৩৭২, ৪১০৮ ০৬৭৩

ওয়েবসাইট : www.worldfishcenter.org

প্রকাশনার তথ্যসূত্র : এই প্রকাশনাটি ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে ওয়ার্ল্ডফিশ বাস্তবায়িত ফিড দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার অ্যান্ড নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "বাগদা চিংড়ি (*Penaeus monodon*) নার্সারি ও চাষ ব্যবস্থাপনা" পুস্তিকা যার প্রধান সম্পাদক (১) মোঃ রফিকুল ইসলাম, (২) ড. মোঃ জিল্লুর রহমান, (৩) মোঃ জিমি রেজা, (৪) মোঃ তোফাজউদ্দিন আহমেদ, (৫) মোঃ মাহবুবুল হাসান এবং প্রকাশ তারিখ মে, ২০২৩ হতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত এবং ছবি ব্যবহার করে হালনাগাদ ও উন্নত করা হয়েছে।